আমি ও আমার সময়

শর্বরী রায়চৌধুরী

মা

মা একটু একটু ছবি আঁকতেন, আলপনা - টালপনা দিতেন। মা দুপুরবেলা আমায় ঘুম পাড়াতেন। আমি মাটি নিয়ে গিয়ে মাকে দিতাম, আমাকে পাখি না বানিয়ে দিলে আমি ঘুমোব না। মা তখন নিজে যা পাখি বানিয়েছিলেন, সেই পাখি এখনও আমি চেষ্টা করে বানাতে পারি না। তার একটা অন্য ভাব ছিল। আমি তখন থেকেই মাটি নিয়ে কাজ করতাম। বাবাও কিছু বলতেন না। বড় ভাই খুব শাসন করতেন। সেইজন্য শেষ অব্ধি ঘর থেকে পালিয়ে গেছিলাম।

ছেলেবেলা থেকেই আমি খেলাধূলো-টুলো করতাম না। তাতে মা-বাবার মনে হত এর হয়ত স্বাস্থ্য খারাপ।

মা -বাবার দুঃখ ছিল খেলাধূলা করতাম না, সবার সঙ্গে মিশতাম না, খালি মাটি নিয়ে বসে থাকতাম বলে। সেটা আমার মস্ত খেলা মনে হত। ওর মধ্যে মধ্যে নৌকা চালাতে ভালোবাসতাম। মাছ ধরতাম। বড়শীতে মাছ ধরতে টাইমিং জ্ঞান ছিল না। মাছ এসে টোপ খেয়ে যেত। তবু বসে থাকতে, জলের মধ্যে মাছের মুভমেন্ট দেখতে খুব মজা লাগত। দেব-দেবীর মূর্তি বানাতাম, কিন্তু পড়াশুনায় মনটন ছিল না। তারপর তো আমার বড় ভাই জোর করে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলাম। দেশের বাড়িতে থাকলে হয়ত পালাতাম না। কারণ মা-বাবার একটু অদ্ভুত স্নেহের মধ্যে জড়ানো ছিলাম তো। আমরা চার বোন, দুই ভাই। কিন্তু তার মধ্যে আমার মনে হত মা আমায় সব চাইতে বেশি ভালোবাসেন।

মনে আছে, আমি তখন খুব ছোট, একটা কুকুর বানিয়েছি। তার কোমরটা সোজা হয়ে গেছে। মা বুকের দিকটা চওড়া করে কোমরের দিকটা সরু করে দিলেন। এইভাবে একটু আধটু বলে দিতেন। তাতেই আমার কত সুবিধে হত। এখন এই বুড়ো বয়সে কত কি মিস করে, ভুলে যাই, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ছেলেবেলার সেই দিনগুলোকে এখনো ভুলতে পারি নি।

দাদার ধারণা ছিল, বাড়িতে থাকলে আমি নষ্ট হয়ে যাব। তাই জোর করে দাদাই আমাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

আর্ট কলেজ

কলকাতায় এসে বিদেশী শিল্পসংক্রান্ত জার্নাল ঘাঁটতাম। সেখানেই দেশীয় সুরের কিছু কাজ দেখে, মূর্তি গড়ার ইচ্ছে তো জাগেই, তা ছাড়া মনে হত কবে এই সব মহাপুরুষদের কাছাকাছি যেতে পারব। তখন থেকে ঘরে নানারকম বাধা থাকা সত্ত্বেও আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মাটি দিয়ে কাজ করতাম। তারপর বাবার অনুমতি পেয়ে ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে যাই। ওখানে বছর খানেক পড়ি। সেই সময়ে স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রদোষ দাশগুপ্তের উপর একটা মস্ত বড় লেখা বেরোয়, প্রচুর ছবি-টবি দিয়ে। তাতে ওঁর স্টুডিওর নাম ঠিকানা ছিল। কাজ করছিলেন। ৬ ফুটের চেয়ে লম্বা - সুদর্শন মানুষটিকে দেখে তো বুকের টিপটিপানি বেড়ে গেল। প্রণাম করলাম টিপ করে। প্রথমে জিজ্ঞাস করলেন। কি কর? বললুম, একটু আধটু আঁকি। মাটি দিয়ে মূর্তি বানাই।

খুবই ভয় করছিল। তবু প্রথম দিনেই বলে ফেললাম আপনি যদি অনুমতি করেন তো আমার কাজ এনে আপনাকে দেখাই। ওঁর অনুমতি পেয়ে পরের দিনই মাটির তৈরি ছোট ছোট কয়েকটা কাজ এনে দেখালাম। প্রদোষবাবুর কাজগুলো ভালো লেগেছিল। ওনার এক ছাত্র কমল রায় তখন দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরও ভাল লাগলো কাজগুলো। কাজ ভালো লাগলেও, প্রদোষবাবু বললেন, তোমাকে ভর্তি করা মুশকিল। আমার এখানে জায়গা কোথায়? তখন কমল রায় বললেন, আপনি যদি ওকে না শেখান, তাহলে যাবে কোথায়?

কমল রায় খুব গিফ্‌টেট স্কাল্পটর ছিলেন। লন্ডনে ১০ বছর কাটিয়ে সুইসাইড করেন। কমল রায়ের কথায় উনি রাজি হয়ে গিয়ে আমাকে ভর্তি করে নিলেন। আমি ইন্ডিয়ান স্কুল ছেড়ে দিয়ে প্রদোষবাবুর ওখানে চলে এলাম। ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে মডেলিং -এর কোন ডিপার্টমেন্ট ছিল না। প্রদোষদার ওখানে কাজ করি সকাল ৮টা থেকে ১২টা। আবার বিকেল ৪ টে থেকে রাত ৮টা। থাকতাম চেতলায়। দাদার কাছে। দাদা একদম পছন্দ করতেন না বাড়ির বাইরে এতখানি সময়। ফলে আমাকে চেতলার বাড়ি ছাড়তে হলো। আমার গুরুজী মানে প্রদোষদা-ই আমাকে আশ্রয় দিলেন থাকার। প্রদোষদার ওখানে দু-বছর কাজ করার পর তিনি গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে প্রফেসার হয়ে ঢুকলেন। তখন একদিন আমাকে বললেন, দেখ তোমাকে তো আমি তেমন করে মডেল - টডেল দিতে পারছি না। তুমি বরং গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজেই ভর্তি হয়ে যাও। ওখানে লাইফ-স্টাডি করতে পারবে।

৫১-তে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমার কাজ দেখে প্রিন্সিপ্যাল রমেন চক্রবর্তী বললেন, তুমি তো বেশ ভালো কাজ করেছ। তুমি থার্ড ইয়্যারে অ্যাডমিশন নাও। গোপালবাবু মানে গোপাল ঘোষ বাধা দিলেন। না, দুবছরের প্রিপারেটরি কোর্সটা করতেই হবে। আর্ট কলেজে জীবনে আমি কটা কথা বলেছি, তা গুনে বলা যায়। কথা প্রায় বলতামই না। কথা আমার এখনও বেশি বলতে ভালো লাগে না। যখন কাজের কথা চিন্তা করি, তখন কথা বললে কাজের এনার্জি চলে যায়।

একদিন আর্ট কলেজ থেকে পালিয়ে গিছলাম তাড়াতাড়ি। আড্ডা মারতে বা সিনেমা দেখতে নয়। বাড়িতে একটা কাস্টিং করেছিলাম। সেটা কতক্ষণে খুলে দেখব, তারই টানে ১৫ মিনিট আগে বেরিয়ে এসেছিলাম কলেজ থেকে। প্লাস্টার কাস্ট। শীতের দিনে আলো কমে আসে

তাড়াতাড়ি। তাই তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম ওটাকে চিপ আউট করতে। তাইতে প্রদোষদার কি রাগ! আর কি ধমক?

উনি ঠিক খেয়াল রাখতেন আমি সময় মতো ক্লাশে যাচ্ছি কিনা। সময় মতো বেরিয়ে আসছি কিনা। তবে আমরা যে মাস্টারমশাই পেয়েছি তা ভাগ্যে জোটে। অ্যাকাডেমির স্টাডি থেকে আরম্ভ করে কিভাবে ফর্মকে গড়তে হয়, এত সুন্দর করে শেখাতেন, এটা আমরা সত্যি ফিল করি। আমাদের ইন্ডিয়ান আর্ট ইউনিস্টিউটে সবই তো প্রায় স্পুন ফিডিংয়ের মতো হয়। উনি কিন্তু কখনও আমাদের কাজে হাত দিয়ে দেখাতেন না। আগে এসে বলতেন তুমি কি করতে চাইছ? দেখো এরকম এরকম নানারকম কাস্ট হয়। তুমি যদি আমি হতাম, আমি এরকমভাবে দেখতাম। এই যে ইনডিভিজ্যুয়াল এক্সপ্রেসানে উনি ইন্টারফেয়ারও করছেন না, অথচ উনি নানারকম রাস্তা দেখাচ্ছেন। এইটা খুব দরকার আর্ট এডুকেশনের পক্ষে।

প্রদোষদা-র বাড়িতে যে ঘরে আমি থাকতাম, তার পাশের ঘরে একটা ফুলসাইজ মিরর ছিল। আমি মডেল পেতাম না বলে নিজেকে নগ্ন করে মিররে দেখে নিজের স্কেচ করতাম। পরে সেই স্কেচ থেকে আমার মূর্তি করেছিলাম।

গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে আমাকে রথীনবাবু মানে রথীন মৈত্র আর গোপাল ঘোষ ডাকতেন 'বাঁশ বেঁতাইয়া' বলে। আসলে আমার তুলি কেনার পয়সা ছিল না বলে আমি বাঁশ থেঁতিয়ে তুলি বানাতাম। তখন গোপাল ঘোষের যে ওয়াটার কালার স্কেচ দেখেছি, তার তুলনা নেই। সামনে বসে কাজ করা দেখেছি। বিদেশী মাস্টারদের সমান দাপটের কাজ। এক সময়ে আমাকে তুলি কালি খাতা কিনে দিয়েছেন কতবার, বলতেন, আমারও এক সময় এসব কেনার পয়সা ছিল না। এখন হয়েছে। তাই তোমাকে দিচ্ছি।

প্রদোষদা আর কমলা বৌদি-র যে কাজ দেখেছি সেটাই আমার সারা জীবনের প্রেরণা। আর ওঁদের কাছ থেকে যে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, তার জন্যে আমি সৌভাগ্যবান।

ইতালীতে

গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে বেরোলাম ৫৬ সালে। ৫৭ - তে পেলাম কালচারাল স্কলারশিপ। তারপর মাঝখানে প্রদোষদার ওখানে কাজ করেছি। কলকাতাতে –ওঁর স্টুডিওতে। তার আট -ন-মাসের মধ্যেই প্রদোষদা দিল্লি চলে গেলেন। আমি খুব বিপদে পড়ে গেলাম। প্রদোষদা বললেন, তুমি রামকিংকরের কাছে যাও। তখন আমি প্রথম শান্তিনিকেতনে গেলাম। রামকিংকরের ওখানে দু রাত্তির ওনার বাড়িতে ছিলাম। উনি খুব আতিথেয়তা দেখালেন। খুব আদর যত্ন করে রাখলেন ওঁর বাড়িতে। খাওয়ালেন-দাওয়ালেন। উনি কিছুতেই রাজি হলেন না আমায় স্কালপচারাল স্কলার হিশেবে অ্যাকসেপ্ট করতে।

কিংকরদা বললেন, তুমি শঙ্খর কাছে যাও। তখন প্রদোষদা দিল্লিতে। শঙ্খদাকে লিখলেন। শঙ্খদা রাজি হলেন।

বরোদা থেকে ৩ বছর পরে ফিরে এলাম। ওখানে থাকাকলীন সতীশ সিংহ ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষক হিশেবে কাজ করার আমন্ত্রণ জানালেন। ওঁরা তখন মডেলিং -এর ক্লাস খুলেছেন সেখানে। ইন্ডিয়ানআর্ট কলেজে বছরখানেক কাজ করার পরই ইতালীর সরকারের স্কলারশিপ পেয়ে ইতালী যাই। আমার অ্যাডমিশন হল ফ্লোরেন্স আকাদেমিতে।

ফ্লোরেন্স বড় মজার জায়গা। ওরা মাইকেলএঞ্জেলো ছাড়া চিন্তা করতে পারে না। ওদের যেটা সবচেয়ে বড় গির্জা, পিয়াৎসা দেল দুত্তমো, সেখানে মাইকেলএঞ্জেলোকে বসানো হয়েছে ভগবানের আসনে। লা পিয়েতা ভাস্কর্যে ড্রাপারিতে মোড়া, ঘোমটা দেওয়া যে মূর্তি, সে তো মাইকেল এঞ্জেলোরই। দুত্তমের ডোমটাও তাঁর নক্শায় তৈরি। তাঁর পাশে যে টাওয়ার, সেটা জিয়েত্তোর। গোটা শহরে মাইকেলএঞ্জেলো কামে উন দিও, মানে ভগবানের মতো। একদিন আমার বাসায় সমস্ত প্রফেসর। ওখানকার পেনটিং -এর প্রফেসর আমায় জিজ্ঞেস করলেন, মাইকেল এঞ্জোলো তোমার কেমন লাগে? আমি খুবই সসঙ্কোচ জানালাম– মেল ফিগার যা করেছেন, তার জোড়া নেই। কিন্তু ফিমেল ফিগারগুলো সব ভালো লাগে না। বড্ড মাসকিউলার। ২৬ বছর বয়সে যে ডেভিড করেছেন, কী সাংঘাতিক কাজ! অতবড় কাজ– মনোলিথিক। এইটুকু বলেই ভয় পেয়ে গেলাম। হয়তো মার খাব এদের হাতে। এল গ্রেকো মাইকেলএঞ্জেলোকে সমালোচনা করে মার - খাওয়ার ভয়ে পালিয়ে গিছলেন। প্রফেসর বললেন, মাইকেলএঞ্জেলো হোমে সেকসুয়াল ছিলেন। তাই তিনি পুরুষ দিয়েই সব কিছুর মডেলিং করতেন। তাই ওঁর নারীরা অমন মাসকিউলার। আমি বললাম, তাই হবে। তাহলে আমি প্রণাম করছি। কোয়ালিটি দূরের কথা, কোয়ানটিটিও করতে পারব না তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ফ্লোরেন্সে খুব মিউজিক শুনতাম। ওখানেই শুনি ইহুদি মেনুয়িনের ভায়োলিন আর তাঁর পেজ এফ্সিবা- পিয়ানে। আমি ওঁদের আলি আকবর, রবিশঙ্কর বলতে খুব খুশি। বললেন, ইয়েস, দে আর আওয়ার গুড ফ্রেন্ডস্। খুশি হয়ে অটোগ্রাফ দিয়ে দিলেন আমার খাতায়। মিউজিক শুনেছি প্রচুর। বাস, মোৎসার্ট, বেঠোফেন তো আছেনই। আন্তেনিও ডিভালদি-র করেল্লির। ওঁরা গ্রেট। মিউজিক শুনেছি প্রচুর। সংগ্রহও করেছি সাধ্যমত। ফ্লোরেন্সের গ্যালারিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে দারুণ উপকার হয়েছিল আমার। অবশ্য আমার কাজকর্ম দেখে তা বোঝা যাবে না। কারণ মাথাটা বড্ড নিরেট। তবু গ্যালারি দেখতাম, ওতেই মন ভরে যেত। আর ফ্লোরেন্স জায়গাটাও, তার রাস্তাঘাট, যেন এক গন্ধর্ব রাজ্য। কি ছেলে, কি মেয়ে, যেন কিন্নর - কিন্নরী সব। এখানকার কোনো কিছুই যেন মানুষের তৈরি নয়। ভগবানের নিজের হাতে গড়া – এমন সুন্দর।

ঐ খানে মাস্টারদের যে সব কাজ আছে, বতিচেল্লির বড় বড় সব অরিজিন্যাল, তারপর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, এত বড় পেইনটিং আনফিনিশড। ঐ সব আনফিনিশড্ কাজ দেখলে বোঝা যায় মাস্টাররা কীভাবে ধরে ধরে ডেভেলপ করে, কালার - টালার দিয়ে খানিকটা অ্যাকাডেমিক স্টাইল,

আর খানিকটা নিজেদের মতো গড়ন, তার যে ভেতরকার ড্রইং– সেটা দেখে একটা দারুন একসাইটমেন্ট হয়। ঐ প্রসেসটা খানিকটা ধরা যায়, যে কিভাবে কাজ শুরু করেছিলেন। আমাদের ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে একটা পার্বতীর মূর্তি আছে।

সেই মূর্তিটাকে খানিকটা কার্ভ করে, এমনি তো সলিড কাসিং হত ব্রোঞ্জের, ওগুলো সব সলিড কাস্টিং, তারপরে, একটু মোটা মোটা করে রাখা হত। একটা পা চিজল দিয়ে কেটে ফিনিশ করেছে, আর একটা পা করে নি। এত বড় সেই পার্বতী মূর্তি। ওর তো কাস্ট বিক্রি করছে, সামান্য টাকায়। শিখবার মতো জিনিশ। পুরীতে গিয়ে যারা পট করে, সেই পাথুরিয়া শাহিতে গিয়ে একটা আনফিনিশড পট কিনে এনেছিলাম। কি বং লাগিয়েছে! ফিনিশিড কাজে অত মজা পাওয়া যায় না। আনফিনিশড কাজে কালার বাগাবার ধরনটা বোঝা যাচ্ছে। রাগে বিল্ড আপ হচ্ছে যেন, কীভাবে গড়ে উঠছে, সেটা অনুভব করে যে আনন্দ উপলব্ধি করা যায়, সেই রকম আনন্দ পাওয়া যায় আনফিনিশড কাজ দেখে। স্কলারশিপের শেষে কয়েকজন মাস্টারের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। প্যারিসে গিয়ে জ্যাকোমিত্তি। জাদ্‌কিন। লন্ডনে গিয়ে হেনরি মুর। কাছাকাছি না গেলে বোঝা যায় না এঁদের হাইট কিরকম। আর যত কাছে যাচ্ছি এঁদের নিজেকে বামন মনে হচ্ছে। নিজের কোনো অস্তিত্ব যেন নেই। কোনো ঢং বা ভনিতার কথা নয়, সত্যি।

জ্যাকোমিত্তি

যখন প্রথম আলবার্তো জ্যাকোমিত্তির স্টুডিওতে যাই, তখন ওনাকে আমার কাজ দেখে কিছু মতামত দিতে বলেছিলাম। তখন তাঁর ষাট বছর বয়েস। উনি বললেন, দ্যাখ্যো, আমি নিজেই কনফিউজড্, নিজে কিছু শিখি নি। আমি তোমাকে কি বলব! আমি তখন বলেছিলাম, আপনারা পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ, আপনারা যদি এমন কথা বলেন, তা হলে আমাদের তো কোনো কাজ করার ব্যাপারেই ভাবা উচিত নয়।

তারপরে ওঁকে অনেক আবদার-অনুরোধ করার পর উনি কাজ দেখলেন। কিছু বললেন। ওঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মিউজিক শুনতে আপনার কেমন লাগে?

মৃত্যুর পর জ্যাকোমিত্তির খুব খ্যাতি হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন পৃথিবী সেরা ভাস্কর। তবে এসব বিচার বড় আপেক্ষিক, ওঁদের কন্‌টেমপোরারিদের কেউ কেউ তো বেশ গালাগাল দিয়েছেন। বলেছেন, ঠিক আছে, হেনরি মুর গিফ্‌টেড কিন্তু ফর্ম তৈরি করতে পারেন না। আর জ্যাকোমিত্তি সিরিয়াস স্কাল্পটর নন। এসব শুনলে কনফিউশড হয়ে যেতে হয়।

প্যারিসে আর সুইজারল্যান্ডে জার্মান রিসিয়ার -এর কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। জার্মান রিসিয়ারের গল্প আমি শুনেছিলাম কমল রায়ের কাছে। বলেছিল ওঁর যা কাজ, না দেখলে ধারণা করা যায় না। আমি ওঁর ১৪০টা অরিজিন্যাল কাজের একটা বড় প্রদর্শনী দেখেছিলাম জ্যুরিখ মর্ডান আর্ট মিউজিয়ামে। ওঁর স্বামী ভেনিংগারও স্কল্পটার। ওঁর স্বামীর কাজ দেখে মনে হয় ওঁর থেকে ইনফ্লুয়েনসড। কিন্তু জার্মান রিসিয়ারের কাজ এত সাংঘাতিক, মনে হয় একদম ভেতরের স্ট্রাকচার থেকে ওপরের যতখানি ফ্লেশ বা স্কিনে লাগবার চেষ্টা করেছে, মানে হিউম্যান ফিগারই করেছে, অজস্র হিউম্যান ফিগার করেছে, কিন্তু তার যে একটা প্লাস্টিক কোয়ালিটি, কোনো তুলনা নেই। আমার মনে হয়েছে, পুরনো দিনের এইসব রদ্যাঁ-টদ্যাঁকে বাদ দিচ্ছি, কিন্তু তারপরে ঐ ধরনের কাজ আর কারা করেছেন? জ্যাকোমিত্তির কাজ অবশ্য আমি দেখেছি। জ্যাকোমিত্তির স্টুডিওতে গিয়ে আমার একটা উপকার হয়েছিল, কাজ করার 'মাস্টার'দের যদি এক এক জনের কাজ করার পদ্ধতি দেখা যায়, তাহলে শেখাও যায় বেশ কিছু। সেগুলো দেখে অনেকটা আনন্দ হয়। এই সেদিন একটা বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখছিলাম, সেখানে একটা ফটো তোলা আছে, জ্যাকোমিত্তি কিভাবে ক্লে হ্যান্ডেলিং করছেন। ঐটা দেখে আমার মনে পড়ে গেল উনি আমায় পারমিশন দিয়েছিলেন উনি যে কাজ করছেন, তার ছবি তোলার জন্যে। আমি ওঁর অনেকগুলো ছবি তুলেছিলাম। একটা জায়গায় গিয়ে দেখলাম উনি একটা হেড করছেন। আমাদের বলাইবাবু যেমন ব্লাকবোর্ড করতেন, আর্ট কলেজে। দুই হাতে চক ধরে সিমেট্রিকাল ড্রইং করতেন। ঐ ভদ্রলোককে দেখলাম ঐ ভাবে ক্লেহ্যানেজ করছেন– এর ছবি তোলা আছে আমার কাছে। দুটো বুড়ো আঙুল একসঙ্গে মুভ করছে। অদ্ভুত লেগেছিল। তবে এসব ক্ষমতা তো আমাদের হবে না। প্রথম দর্শনেই ওঁর চেহারার সঙ্গে ওঁর কাজের একটা অদ্ভুত মিল চোখে পড়েছিল। ওঁর খুবই স্ট্রাগলিং লাইফ। মার-খাওয়া জীবন। সেটার ছাপ যেমন ওঁর চেহারায়, তেমনি ছবিতে। বাড়ি ছিল সুইজারল্যান্ড আর ইতালীর বর্ডারে, স্তাম্পায়। ওখানে গেছি। দুদিকে অনেক পাহাড় উঠে গেছে। মাঝখানে উপত্যকা। সেইখানে বাড়ি। ওঁর বাবা জিওভান্নি জ্যাকোমিত্তি ছিলেন নামকরা পেন্টার। নিজের স্টুডিও বানিয়েছিলেন শালবাল্লা দিয়ে। একজন আর্টক্রিটিক আমাকে বলেছিলেন, স্তাম্পায় বছরে দুমাস সূর্যের আলো পৌঁছয় না। ফলে গাছ-টাছগুলো গ্রোথ যা হচ্ছে সেটা সূর্যের আলোর জন্যে ক্রমশ উপরে দিকে। গাছপালাগুলো তাই অসম্ভব লম্বা। ঐ কারণেই, অর্থাৎ ঐ পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে, জ্যাকোমিত্তির ভাস্কর্যের মানুষ অমন লম্বা। যদিও অনেকে কমপারেটিভ স্টাডি করতে গিয়ে মিল দেখান প্রাচীন ইউট্রুসকান কাজের সঙ্গে। সন্ন্যাসীর মতো ঐ মানুষটিকে সামনে থেকে দেখার স্মৃতি ও সৌভাগ্য জীবনে ভোলার নয়। আরও একটু। ভালো লেগে যাওয়ায় কিনে নিয়েছিলেন আমার একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি।

হেনরি মুর

হেনরি মুরের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকেও জিজ্ঞেস করেছিলুম, আপনি মিউজিক শোনেন? বলেছিলেন, শুনি। তবে ঐ যে বাজিয়ে দেবে, এটা একটা সমস্যা। আমার মেয়ে শোনে। পরের বার যখন যাই ইন্ডিয়ান মিউজিকের রেকর্ড নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন হেনরি মুর লন্ডনেই ছিলেন। আমি ওঁর সঙ্গে দুবার দেখা করি। প্রথমবার যাই ইটালীয়ান সরকারের স্কলারশিপে। পরের বার আমেরিকানদের আমন্ত্রণে। হেনরি মুরের মুখ

থেকে ফর্ম নিয়ে আলোচনা শুনেছি একদিন। বলেছিলেন আমাকে ও মারিনা মেরিনিকে। মারিনা ও হেনরি কনটেমপোরারি। মারিনাকে বলছিলেন ইতালীয়ান ভাষায়।

আর ইটালিয়ান ভাষায় আমি তো খুব পন্ডিত নই। তবে মোটামুটি বুঝেছি। আমি একটা কাজ করেছিলাম মেটাল প্লেট দিয়ে – রিক্লাইনিং ফিগার, উনি তার ফটো দেখে বললেন, এটা খুব সুন্দর। কিন্তু এটার যা ফর্ম হয়েছে, তার একটা ওয়ার্ম কোয়ালিটি আছে। যদি তুমি আমার কাছে কয়েকদিন থাকতে, সেটা কি আমি তোমায় দেখিয়ে দিতে পারতাম। সেটা কি আমি জানতে চাইলাম। উনি বললেন, এই অল্প সময়ে তোমায় আমি কি বোঝাব? তুমি যে কাজটা করেছ, সেটা এমনিতে ভালো। তবে শীতের দেশের জন্যে হলে এটা খুব ভালো হতো। এটা গরমের দেশের জন্য নয়। এই যে এইসব কথাগুলো আমি ওঁদের কাছ থেকে শুনলাম, কখনও ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে পারলাম না। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ফর্মগুলোকে ওঁরা কে কি ভাবে দেখাচ্ছেন, অন্য ফর্মের ব্যাপারটা দেখলে মোটামুটি বুঝতে পারি। একটা লাইভলি, একটা ডেড। প্রথম যেবারে হেনরি মুরের কাছে যাই, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার কিছু ব্রোঞ্জের কাজ আর অন্য সব কাজের কিছু ফটোগ্রাফ। ফোর্থ ইয়ারে একটা কাজ করেছিলাম, গাগরি ভরণে। সেই মূর্তিটার ফর্ম সম্বন্ধে কিছু বললেন, ছবির পিছনে ড্রইং করে। বোঝাতে বোঝাতে এক সময়ে বললেন যে তুমি যখন সামনে মডেল বসিয়ে কিছু করবে, এলবো বা বাহুমুল বা জোড়ের জায়গালুলোয় চোখে যা দেখবে তার চেয়ে একটু ভরাট করে নেবে। তাহলে দেখবে ফর্মটা জোরালো হয়ে উঠছে অনেকটা। মূর্তিতে আইডিয়ালিস্টিক ভাব আসছে।

উনি খুব লাইফ স্টাডির উপর জোর দিতেন। ওঁরা যতই এ্যাবসট্রাকশন করুন, আসলে কিন্তু এখনো হিউম্যান ফর্ম-এর অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষের বা জীবনের স্পর্শে যে ফর্ম তৈরি হয়, তার স্বাদ আলাদা। তাতে অনেক বেশি জ্যান্ত ভাব থাকে, মেকানইজড মনে হয় না আর। ব্রোঞ্জে কাজ করার সম্পর্কে উনি বলদেন, যেখানে সারফেস খুব স্মুথ করে তৈরি করা হবে, প্রথমত প্লাস্টারের মূর্তি থেকে যে মেটালে ট্রান্সফার হচ্ছে, সেখানে মেটালে ঐ মিডিয়ামের কথা ভেবে তার উপর ডাইরোট ডিজেল-হ্যামার দিয়ে কাজ করতে হবে, ব্রোঞ্জের যে ফ্লুইডিটি তার সঙ্গে লাইফের স্পর্শ বজায় রাখার জন্যে। উনি সব সময়েই বলতেন যে, ঐ ব্রোঞ্জের জিনিশটা যন্ত্রে না করে হাতে করলে জীবনের স্পর্শ বেশি করে পাওয় যায়। সেটা মেশিনে ফিনিশের চেয়ে সুন্দর হয় বেশি। এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উনি হ্যানস আর্পের কাজ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, আর্পের ফর্ম খুব সুন্দর কিন্তু অধিকাংশ কাজে যন্ত্র ব্যবহারের ছাপ।

হেনরি মুর অসম্ভব পন্ডিত মানুষ।

মারিনো মারিনি

মারিনো মারিনির স্টুডিওতে প্রথম যেদিন গেলাম, উনি আমাকে একটা হেড দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, চিনতে পারো।

আমি বললাম, হ্যাঁ হেনরি মুর। উনি হাসলেন, বললাম, কোথায় পেলেন ওঁকে? মিলান্তোতে এলে আমার কাছে ওঠেন। চমৎকার কাজ। ভেতরকার ক্যারেকটার রেখে। অ্যাবস্ট্রাক্ট প্লেনস রেখে, এমন স্ট্রংলি ওঁর পার্সোনালিটি প্রকাশ করেছেন যে, আমার মনে হয় অ্যাকাডেমিক স্টাইলে সম্ভব হত না ওটা। আরো একটা প্রোট্রেট দেখালেন কমপোজার স্ত্রাভিনস্কির। অনবদ্য।

আমি ও আমার সময়

আমার কাজ দেখে মোটামুটি খুশি হয়েছিলেন তিনি। ওঁকে একটা মূর্তি দেখিয়েছিলাম আমি, ডাইরেকট মেটাল সীটের করা। সেটা দেখে উনি বললেন, এই ফর্মটা খুব ঠান্ডা। এটা একমাত্র বরফের দেশের জন্যে মানানসই। তুমি আমার সঙ্গে বেশি সময় থাকলে ফর্ম-এর ওয়র্ম কোয়ালিটি কি করে হয়, আমি প্রাক্টিক্যাল জেমনেসট্রেশন দিয়ে বোঝাতে পারতাম। আমি মাত্র দুদিন ওঁর স্টুডিওতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই পুরনো গ্রীক এট্রুসকান হর্স থেকে শুরু করে মডার্ন পিরিয়ড পর্যন্ত যত রকম হর্স দেখেছি, তাঁর হর্স বা হর্স রাইডার বা ফলিং হর্স-এর মতো কাজ কখনো দেখি নি আর।

রামকিংকর

কিংকরদার কোনো স্কালপচার বা মূর্তি করা চোখে দেখি নি। তাঁকে দু একবার পেইনটিং করতে দেখেছি। কিন্তু আমি যখন গেছিলাম তখন কিংকরদার সেরকম কাজ করার ক্ষমতা ছিল না। আমি যখন শান্তিনিকেতন গেছি, ততদিনে কিংকরদা রিটায়ার করে গেছেন কিংকরদার কাজ সাংঘাতিক পাওয়ারফুল। আমার কয়েকটা কাজ খুব মনে পড়ে। যেমন উনি 'যক্ষ-যক্ষী' অনেকগুলো সিরিজ করেছিলেন দিল্লির জন্যে। এগুলো দেখলে অনেকে শিখতে পারে। উনি প্রথমে কুষাণ পিরিয়ডের যে যক্ষ-যক্ষী, তার মোটামুটি একটা আর্টিস্টিক কপি করলেন। মানে মাছিমারা কপি নয়। তারপর ওটা থেকে আস্তে আস্তে ইভলভ করে উনি নিজে যা তৈরি করলেন, তার একটা যক্ষী দেখে আমি তো অবাক! এরকমও হতে পারে? মোটা করে তৈরি করেছেন ফিগারটা। সেটার জন্যে আমার খুব আফশোস লাগে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দিল্লির জন্য হয়ত তাদের পয়সার জোরে সব এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এরকম একটা জিনিস আমাদের এখান থেকে চলে গেলে, ওটা দেখতে পাব না, খুব সচরাচর দেখতে পাব না ভাবলে খুবই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেটা প্রায় সাড়ে তিন/চার ফুট হাইটের প্লাস্টার তৈরি ন্যুড ফিগার। জিপসি! কি সুন্দরী। পা দুটো বোধহয় একটু ফাঁক করে দাঁড়ানো। গলার ওরে বোধহয় একটা গহনা আছে। এটুকু আমার মনে পড়ছে। কিন্তু তার এই বুক থেকে আরম্ভ করে কোমর, তারপরে তলপেট, তারপরে পা – এমন সুন্দর একটা পরিচ্ছন্ন রেনডারিং যে কি বলব! আর এত সহজে ঐ

মেয়েছেলে ফর্মটাকে নিয়ে এসেছেন, ভাবা যায় না। অনেক সময় দুটো তিনটে ব্রাশ স্টোকে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে না, এরকম একটা ব্যাপার। অথচ ক্ল্যারিটি। আমি হাঁ হয়ে গেছি। ওটার কথা আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়। তারপরে কয়েকটা হেড কি সাংঘাতিক! ঐ যে চোখগুলো বেরিয়ে এসেছে, কি একটা মেল হেড, মোচ আছে, না রবীন্দ্রনাথ নয়– তারপরে ঐ যে গান্ধীজী খুব দারুণ। কিংকরদা জ্যাকোমিতিকে খুব একটা পরোয়া করতেন না, সেটা ওঁর কথায় মনে হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, (কিংকরদা ছাত্রদের মধ্যে) জ্যাকোমিত্তি থেকে অনেক গ্রেট কিংকরদা। সুজাতা দেখিয়েই বলে?

কিংকরদা খুব মজার মজার কথা বলতে ভালোবাসতেন। আর ওরকম একটা পার্সোনালিটি পৃথিবীতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গানটানও ভালোবাসতেন। ওঁর ক্লাসিকাল মিউজিকের লাইকিং ছিল। কিংকরদার ভেতর ফর্ম, স্ট্রেংথ – স্ট্রাকচারের যে কোয়ালিটি বা ফিগার আছে, সে ধরনের গানটান হলে উনি খুব এনজয় করতেন। এ সম্বন্ধে উনি অনেক কিছু বলেছেন। উনি আমায় অনেকবার বলেছেন, তোমার কাছে ভাগনার আছে? ভাগনার? ভাগনার আমার খুব ভালো লাগে। ভাগনারের মিউজিক খুব হেভি। ভাগনারের মিউজিক সত্যজিৎ আমাকে অনেক শুনিয়েছে। তুমি আমায় একটু ভাগনার শোনাও। তারপরে মাঝে মাঝে গলা ছেড়েও ওরকম ভলিউমে গেয়েও ফেলতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতও উনি নিজের কায়দায় গাইতেন।

আমি অনেককে বলেছি, এক একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত উনি এমনভাবে গেয়েছেন, যে রবীন্দ্র ভক্তরাও কেউ গাইতে পারে নি। ওঁর একটা প্রাণঢালা দরদ ছিল না, সেটা আটকে অনেকখানি ছাপিয়ে গেছে। এই শান্তিদেব টেব কি গায়! সেই কিংকরদাকে যখন পদ্মভূষণ দেয়া হলো, ওঁকে একটা রিসেপশন দেয়ার জন্য ডাকা হলো। উনি নিজেই পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণের কোনো তফাৎ করতে পারছেন না। কি যে আমাকে দেওয়া হচ্ছে। তারপর ওনাকে একটা গান গাইতে বলা হলো। উনি গাইলেন– সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা। এই গানটা গাইতে উনি খুব ভালোবাসতেন। আর গাইলেই ওঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসত।

আমি কয়েকবার ওনাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি– কি ব্যাপার? তা উনি বলতে চাইতেন না। ওনাকে আমি ইন্টারভিউ করেছিলাম। তাতে উনি অনেক কিছু পরিষ্কার করে বলে ফেলেছিলেন। টেপটা এখন নেই। সেই ইন্টারভিউতে ওঁর একটা বেদনামাখা ব্যাপার ছিল– ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা। কিংকরদার একটা (এটা অবশ্য আচার্য নন্দলালের কারণেই হয়ে থাকবে), কিংকরদা কিন্তু লোকাল, যেটা কিন্তু আমাদের কোনোদিন হলো না, কিংকরদার কাজে লোকাল সাবজেক্ট নিয়ে এমন একটা আর্ট কোয়ালিটি, প্লাস আমাদের ইন্ডিয়ান গন্ধ আছে– যেটা কিন্তু খুব রেয়ার। আমার কাছে একটা এচিং ছিল কিংকরদার –সাঁওতাল মেয়ে। সাঁওতাল লাইফ নিয়ে উনি তো অনেকদিন ধরে খুব স্টাডি করেছিলেন। সেখানে ছিল একটি সাঁওতাল মেয়ে, ঘাসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তার শাড়িতে চোরকাঁটা লেগেছে, আর একটা সাঁওতাল মেয়ে তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে– এইটুকু। কি সুন্দর ড্রইং করছেন না! ঐখানে ঐ সাবজেক্ট লিখে দিতে হয় না, অথচ পরিষ্কার।

ভাবা আর দেখাটা একসঙ্গে হচ্ছে না। এটা আমার ডিফেক্ট হতে পারে। আজকাল সাঁওতালি মেয়েদের কাছ থেকে দেখছি, উনি ওনার স্টাইলে এদের ক্যারেকটারেসটিকস এত সুন্দর ধরেছেন না, তুলনা নেই। আর তারপরে ওয়াটার কালার। কোনো ইন্ডিয়ান মাস্টার এত ভালো ওয়াটার কালার করেন নি, আমার মনে হয়েছে। একদিন আমাদের এক বন্ধু পি.এল. দেশপান্ডে এলেন। ওঁকে নিয়ে গেছিলাম নন্দনে। উনি বলেছিলেন, কিংকরদার ওয়াটার কালার কিছু আছে শুনেছি দেখতে চাই। স্পেশাল পারমিশান নিয়ে বার করা হলো উনি বসে বসে দেখলেন। একঘন্টা ধরে। পরে বললেন, মস্ত বড় মিউজিক কনফাররেন্সের মাইফেল শুনে এসে যেমন আনন্দ, তার থেকে কিছু কম হয় নি। বরং বেশি হয়েছে। এ আমি কি দেখলাম।

একটা ঘোড়ার ড্রইং আমি জীবনে ভুলব না। একটু লাল দিয়ে ওয়াটার কালার পেইনটিং। তারপর স্কালপচারে একটি ঘোড়া করেছেন, ঘোড়াকে একটি লোক দলাইমালাই করছে, মাসাজ করছে। কাজটা দিল্লি নিয়ে গেছে। কাজটাকে দারুন মনে হয়েছে আমার।

মেয়েদের হস্টেলের সামনে মহিষ আমি আসার অনেক আগে। গোলবলের মতো কাজটা কি সুন্দর বলুন।

গান

ক্লাসিকাল গানে ইন্টাররেস্ট ছেলেবেলা থেকে। আমাদের বাড়িতে, হয়তো আমার জন্মের আগে থেকেই, জমিদার বাড়ি বলে, গানটান হত। কিন্তু বাড়িতে কোনো রেকর্ডের কালেকশন ছিল না। বাইরের লোকজন এসে গাইতেন। বিশেষ করে রাগসঙ্গীত। সেই থেকেই গানের প্রতি ভালোবাসা। ৫৭ সালে ভারত সরকারের কালচারাল স্কলারশিপ পেয়ে বরোদায় যাই। বরোদার সুর-সাগরের পাড়ে একটা দোকানে রেকর্ড বিক্রি হত। জীবনে প্রথম রেকর্ড কিনি আবদুল করিমের। ঝিঞ্চিটি রাগে গেয়েছিলেন– 'পিয়া বিনা নাহি আওয়ত চইন।' কী নম্র মধুর সারগম আর তান। প্রাণ ভরে যায়। গানের নেশা যখন ক্রমশ বাড়তে থাকে, তখন পুরনো রেকর্ড কিনতে শুরু করি বরোদার সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে। তখন দু আনায় পাওয়া যেত পুরনো রেকর্ড। কিনতাম ডজন দরে। ঐ পুরনো রেকর্ডের মধ্যেই পেয়ে যাই জোহরা বাঈয়ের একটা গান। জৌনপুরীতে গাওয়া। গান যে এমন হতে পারে আর মানুষ যে এমন গাইতে পারে, সেটা অবিশ্বাসের মতো মনে হত। নেশায় বুঁদ করে দেয় সে গান। তখন থেকেই তাঁর রেকর্ড সংগ্রহের নেশা। দশ বছর সারা ভারতবর্ষ ঘুরে এবং ঘেঁটে আমি এ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পেরেছি মোটে ১৮ খানা রেকর্ড। সে সব আমার কাছে ঐশ্বর্য। সোনা-দানার চেয়ে বেশি ভারতবর্ষের কী দুর্ভাগ্য, ওঁর মতো শিল্পীর নামডাক হলো না এদেশে। আমি যদি গানের কোয়ালিটি আমার একটা কাজেও রূপ দিতে পারতাম, ধন্য মনে করতাম নিজেকে।

গান শুনে যে মজা পাই, আর্ট দেখে যা মজা পাই, নিজের কাজ দেখে তার উল্টোটা– বিরক্তি ধরে যায়। গান শোনার সঙ্গে আমাদের দেশের যে পুরনো আর্ট দেখি– তার সঙ্গে খুব একটা সিনক্রোনাইজেশন হয় না। কিন্তু আমি জানি না, কেউ কেউ বলেছেন যে, –দু এক বার আমি যখন কাজ দেখাচ্ছি, তখন বলেছেন আলি আকবরের সরোদ বাজছে, এই মিউজিকের সঙ্গে মিল আছে। হয়ত কিছু হয়েছে, হয়ত হয়নি। কিন্তু মিউজিকের মতোই ঐ অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ ধরবার জন্যে, তার নীচে লিখে দিতে হবে না – সেই ফর্মটা দেখে আপনি সেই রাগ - রাগিণী শুনছেন বলে মনে হবে। এটা আমি চেষ্টা করছি। ধরুন আমরা একটা গোলাপ ফুল বসিয়ে ছবি আঁকছি, গোলাপ ফুল হয়তো হচ্ছে কিন্তু তার ফ্লেবারটা তো পাচ্ছি না। এই ফ্লেবারের জন্যে তার নিজস্ব একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ আছে। সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপটা দেখালে হয়ত আর কিছু বলে দিতে হবে না, যা লিখে দিতে হবে না।

মিউজিকের ব্যাপারটা, হেনরি রুশোর পেনটিংয়ে খুব আছে। উনি মিউজিশিয়ান ছিলেন যে। ভায়োলিন বাজাতেন। মিউজিক কমপোজ করতেন রবীন্দ্রনাথের ছবি খুব সুন্দর। কালারগুলো খুব আনইউজুয়াল। ফুলটুলগুলোকে উনি নিজের মতো করে এক একটা জায়গায় রং দিয়েছেন। রাদিচে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের পেইনটিংয়ে স্কিল নেই– একথার কোনো মানে হয় না। হয়ত এমন হতে পারে উনি যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে দেখবার প্রস্তুতি ছিল না ওঁর মনে। অনেক কিছু দেখবার বা জানার জন্যে তাঁর মনের প্রস্তুতি চাই। সব সময় সব জিনিশ ভালো লাগে না। সবারও সব জিনিশ ভালো লাগে না। রবীন্দ্রনাথ বুঝতেও আমাদের অনেক সময় লেগেছে। সব গ্রেট আর্টই লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট হয়, সেটা আমি বিশ্বাস করি না।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে স্কিলের অভাব – এরকম কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ওঁর মতো সেলফ পোর্ট্রেট এঁকে কেউ দেখাক।

বড়ে গোলামের ফটোগ্রাফ দেখে কাজ করেছি। কোনো কমিশনড জব নয়, নিজের থেকে। আলি আকবরকে বলতাম বসতে। বসলেন। এই আদানপ্রদানটা আরও ভালো হত যদি, আমরা ওঁর মিউজিককে যতটা আন্তরিকভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করি, তার দশ ভাগের এক ভাগও যদি ওঁরা আমাদের আর্টকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতেন, তাহলে আদানপ্রদানটা ভালো হত। এঁদের মধ্যে দেখেছি কুমার গন্ধর্বই একটু খানি বেশি ইন্টেলিজেন্ট। মল্লিকার্জুন মনসুরজী তো বিরাট পন্ডিত লোক মিউজিকের। মল্লিকার্জুনজী একটা চমৎকার কথা বলেছেন। স্বামীনাথ এখানে আছেন, রূপংকর মিউজিয়ামের ডায়রেক্টর, তাঁকে বলছেন, দ্যাখো, আমাদের গান - বাজনার রাগ - রাগিনীর তো একটা হিশেব আছে। এইরকম এইরকম তার চলন, এইরকম এইরকম তার স্ট্রাকচার–। কিন্তু তোমাদের কোনো কিছুর তো লিমিট নেই! যা খুশি করে দিচ্ছ! তবে এটা ঠিক, আমাদের পুরনো দিনে যে এই ধারায় পেইনটিং বা স্কালপচার হয়েছে, তাতে কিন্তু প্রচুর মিউজিক্যাল এইলমেন্ট পাওয়া যায়। যা আমি এত বছর বয়েস অব্দি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি। কি জিনিশটা আছে।

স্কালপচার, পেনটিং সব জায়গাতেই মিউজিক আছে। ইলোরাতে নটরাজ দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। নিজে নাচতে শুরু করেছিলাম ওখানে। কত রকম যে নটরাজ দেখিয়েছে ওখানে! আরে বাব্বা:। আর ঐরকম ভলিউমে কাজ। এলোরাই কি সাংঘাতিক কার্ভিং করেছে! ওরকম একটা মনোলিথিক পাহাড়কে কেটে প্রথমে দরজা করেছে, দরজা করে ওপরে গেছে। তারপর সিলিং করেছে। এগুলোকে যে শুধু বিল্ডিংয়ের মতো করেছে তাই নয়, প্রত্যেক জায়গায় যেরকম মানানসই হবে সেইরকম স্পেস রেখে মূর্তি বসিয়েছে। আর মূর্তিতে এতটুকু ফালতু কাজ করলে সেটা তো রিজেক্ট হবে, রিজেক্ট করার মতো কিছু নেই। সবগুলো এমন ক্যালকুলেট করে করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওদের আর্কিটেকচারাল স্কিল দেখুন। পুরো জিনিশটা তো একটা পাথরে, একটা পাহাড় কেটে। তার ওপর ছাদটা কতটা লোড নেবে। তারপর দেখুন দোতলায় যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি কাটতে কাটতে উঠে গেছে। ওটা তো একটা পাথর কেটেই উঠেছে। সিঁড়ি কাটাতেও কোনো ভুল নেই। দোতলার পিলার-টিলারেও না। কাজ করতে গেলে, কাজ ভাঙতে ইচ্ছে করে। কিংকরদাও কথাটা মানতেন। কম ভেঙেছেন তিনি? আমরা অল্পে সন্তুষ্ট বলেই পারি না। আরো তিনটে জন্ম আমি আমাদের দেশের মিনিয়েচার আর্ট, স্কালপচার আর মিউজিক শুনে যেতে পারলে, হয়তো তার পরের জন্মে কিছু করতে পারি। এটা কোনো বানানো কথা নয়। আমার হৃৎপিন্ডের ভিতরের কথা।

লেখাটি আজ থেকে ২৫ বছর আগে প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি ভাস্কর শর্বরী রায়চৌধুরী প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং লেখাটির গুরুত্বের কথা মনে রেখে পুনর্মুদ্রণ করা হলো।